উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ
দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬
জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, বয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

40

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৬ সংখ্যা - ৪ জুলাই-আগস্ট/২০০৯ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

শ্যাওলা বৈচিত্র্য

বদ্ধ জলাশয়ে বা খাল-বিলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। এই উদ্ভিদগুলিকে বলা হয় 'শ্যাওলা' বা 'শৈবাল'। অন্যান্য উদ্ভিদের মত এই শ্যাওলার কিন্তু ফুল হয় না। সাধারণতঃ আমাদের চোখে যে শ্যাওলা জলাশয়ে দেখা যায়, সেগুলি ছাড়া আর এক বিশেষ ধরনের শ্যাওলা আছে, যেগুলিকে সমুদ্রের মধ্যে দেখা যায়। এদেরকে বলা হয় 'সামুদ্রিক শ্যাওলা'।

সাধারণত শ্যাওলা আকারে খুব ছোট কিন্তু সামুদ্রিক শ্যাওলা বেশ বড় আকারের হতে পারে। দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট পর্যন্তও শ্যাওলা সমুদ্রে দেখা যায়। বিরাট আকৃতির শ্যাওলাগুলির মধ্যে সমুদ্রে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় 'মাইক্রোসিস্‌টিস্' বা নিরিও সিস্‌টিস্ নামক শ্যাওলাকে। এরা জলে ভেসে থাকতে পারে একটি বাতাস ভর্তি থলির সাহায্যে। যার নাম 'সারগাসুম'। সাধারণতঃ জলের উপরে শ্যাওলা দেখতে পাওয়া গেলেও, সমুদ্রের ৬০০ ফুট গভীরেও শ্যাওলা দেখতে পাওয়া যায়। শ্যাওলার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, তার মধ্যে থাকে ফস্‌ফেট, পটাস, লবণ ও নাইট্রোজেন। এই কারণে শ্যাওলা, বিশেষ করে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে।

ইউরোপের সমুদ্র উপকূলে

এরপর 3 পাতায়

দুধে বিষ !

শৈশবকাল থেকে আমরা, ভারতীয়রা দুধের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাড়ির বাচ্চারা মায়ের দুধ ছাড়াও গরু, মোষ, ছাগলের ফোটানো দুধ পান করে থাকে। মধ্যবয়স্ক ও বয়স্করা এইসব প্রাণীর দুধ ছাড়াও প্যাকেটের দুধও খেয়ে থাকে। এই দুধকে আমরা সুষম খাদ্যের পর্যায়ে ফেলেছি। কারণ, পুষ্টির জন্য আমাদের শরীরে যা কিছু খাদ্য উপাদান দরকার তা মোটামুটি দুধের মধ্যেই পেয়ে যাই। কিন্তু দুধে খাদ্যগুণের চেয়ে 'খাদ্য দোষ' কতটা ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে আছে, তা আমাদের শিক্ষিত সমাজ কতটা জানে? আমরা ভারতীয়রা দুধ পান করলেও, বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ কিন্তু দুধ পান করেন না। কারণ, আমাদের শরীরের ল্যাকটেজ উৎসেচক দুধের ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ভেঙে দেওয়ার পরে তা ক্ষুদ্রন্ত্রে শোষিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষে কোষে পৌঁছোয়। শৈশবকালে শরীরে ল্যাকটোজের পরিমাণ বেশি থাকায় মায়ের দুধ সহজে হজম হয়ে যায়। ছোট থেকে যত বড় হই, দুধ খাওয়ার পরিমাণটা কমে যায় আর স্বাভাবিকভাবে ল্যাকটোজ বেশি করে না ভাঙায় উৎসেচকের পরিমাণটা কমে যায়। ফলে শরীরে এই ল্যাকটেজ কম-বেশি পরিমাণের ওপরেই নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের দুধও দুধজাত খাদ্যের হজম করার ব্যাপারটি। প্রকৃতির বিধানে যারা বরাবরই দুধ ও দুধজাত খাবার খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত, তাদের উৎসেচকের মাত্রা বেশি থাকায় স্বাভাবিকভাবে দুধ খেয়ে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। তাইতো ইউরোপের রাশিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশের মানুষ দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খেতে বেশি অভ্যস্ত। অথচ আফ্রিকা মহাদেশের লোকেরা অত দুধ পানে অভ্যস্ত নয়। অন্যদিকে এশিয়ার ইরান, ইরাক, বাংলাদেশে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আমাদের দেশ এব্যাপারে প্রায় মাঝামাঝি। অর্থাৎ ল্যাকটেজ কম থাকার জন্যই দুধ হজম করতে না পেরে আমাদের অনেককে পেটের গণ্ডগোলে ভুগতে হয়। এখন প্রত্যেকেই জানেন, দুধ বিশুদ্ধ খাদ্য আর তাতে পুষ্টিগুণ ভরপুর। কিন্তু বহুল ব্যবহৃত দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে যে দুধ আমরা পেয়ে থাকি তা আসলে মোটেই বিশুদ্ধ নয়। আমরা যে টোনড দুধ খাই, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে গুঁড়ো দুধের মিশ্রণ। কাজেই পুরো দুধের উপাদান এখানে আশা করা বৃথা। আবার যেসব অঞ্চলে গরু-মোষের দুধ যথেষ্ট পরিমাণে মেলে, সেখানেও দুধে টাটকা উপাদান আশা করা সমীচীন নয়। কারণ গবাদি পশুর খাদ্যের মধ্যেই পড়ে ঘাস, খড়, খইল, ভুষি

এরপর 2 পাতায়

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু ও সূর্য

এবছর ২০০৯, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ। সারা বিশ্বের পেশাদার ও সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তৎপর হয়েছেন, যেমনটি চারশো বছর পূর্বে গ্যালিলিও প্রথম দূরবীন উদ্ভাবন করে মহাকাশে সুদূর দৃষ্টি প্রেরণ করেছিলেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম বিজ্ঞান হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। মানুষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ নেয় সূর্য ও চাঁদের কাছে। শুরু হয় সময় গণনা। দ্বিতীয় পাঠে মানুষের অন্বেষায় এসেছে নক্ষত্রলোক। সূর্যের অত্যাধিক ঔজ্জ্বল্যের কারণে, অন্য সমস্ত নক্ষত্র আকাশে উপস্থিত থাকলেও, দিনের বেলা আমাদের চোখে তা অদৃশ্য। রাতের আকাশে খালি চোখে কত তারা দেখতে পাই? যদি বলি, লাখ-লাখ-অজস্র, তবে ভুল হবে। দূরবীক্ষণ ছাড়া খালি চোখে আমরা মাত্র ছয় হাজারের মতন তারা দেখতে পাই, তাও উত্তর ও দক্ষিণ -গোলার্ধের অধিবাসীদের মিলিত নিরীক্ষণের ফল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধুনা গণনা অনুযায়ী আবিষ্কৃত নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় চার হাজার কোটি।

কিছু কিছু নক্ষত্রের নামকরণ হয়েছে। যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি

এরপর 4 পাতায়

দুধে বিষ!

1 পাতার পর

ইত্যাদি। আর এগুলোর মধ্যেই লেগে আছে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ও ভারী ধাতুর কণা। এইসব পদার্থ সহজে গরুর শরীরে প্রবেশ করছে। তার ওপর নোংরা জল মেশানোয় স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকছেই। কারণ, জলেও আছে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ছোঁয়া। এই দূষিত পদার্থ আমাদের শরীরে (এমনকি পশু-পাখির শরীরেও) ক্রমাগত জমতে জমতে একসময় জটিল সব রোগে আক্রান্ত হতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্য মারফত শুধু মাত্র দেহে সারা দিনে ডি.ডি.টি. এবং বি.এইচ.সি.-ই যাচ্ছে ০.৫ মিলিগ্রাম। যদিও এটা কিছুটা বিপদসীমার নিচে। কিন্তু গড়পড়তা মার্কিন ও ইংরেজদের চেয়ে এটি চল্লিশ গুণ বেশি। এবং ভারতবাসীরাই এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় দূষিত খাবার গ্রহণ করছে। বিষাক্ত কণাগুলি প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে ফ্যাটি টিস্যুতে জমতে থাকে। এবং সেখান থেকে হৃদপিণ্ড, যকৃত, বৃক্ক, স্তনগ্রন্থিতে ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ স্নায়ুগ্রন্থির রক্তে মিশে ভুণে যায়। পরে স্তনদুগ্ধ পানকারী শিশুদের দেহে যায়। এই সব পদার্থ দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে নষ্ট হয় না ফলে হৃদবৈকল্য, ডায়ারিয়া, লিভার সিরোসিস, ক্যানসার ইত্যাদি আরও জটিল সব রোগ মানুষের সঙ্গী হয়। শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতেও ব্যাঘাত ঘটে। তাই বলা যায়, এখন শিশুরা যেদিন থেকে মায়ের দুধ পান করতে শুরু করে সেদিন থেকেই তারা কীটনাশক ওষুধের অবশেষের শিকার হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী ভারত ও চীন-এর শিশুদের দেহে জার্মান, মার্কিন, ইংল্যান্ডের মাতৃদুগ্ধপানকারী শিশুদের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ডি.ডি.টি-র অবশেষ পাওয়া গেছে (সূত্র - জ্ঞান ও বিজ্ঞান — ১৯৯৪)। গরু-মোষের দুধ আরও ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে 'অক্সিটোসিন' হরমোন ইনজেক্ট করার ফলে। শুধুমাত্র গোপালক বা দুগ্ধব্যবসায়ীরাই নয়, এখন সরকারি-বেসরকারি ডেয়ারিগুলিতে দোহনকালে অবাধে প্রয়োগ হচ্ছে এই ক্ষতিকর হরমোনটি। দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে এটি দিনে অন্তত দুবার গাভীর শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই হরমোন প্রয়োগে দুধের পরিমাণ কখনোই বাড়ে না। এটি দুগ্ধাশয়কে উত্তেজিত করে দুধ বেরিয়ে আসাকে ত্বরান্বিত করে মাত্র। কিন্তু প্রতিদিন এর প্রভাবে জীবটি প্রসববেদনায় আক্রান্ত হয়, জরায়ুর ক্ষতি হয় বেশি। তিন-চার বছরেই এদের গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার এর প্রভাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট উত্তেজনা সহ্য করতে না পারার ফলে দুগ্ধাশয়ের চারপাশে রক্তবাহী উপশিরাগুলি ফেটে যায় এবং রক্ত দুধে মিশে যাওয়ার ফলে হরমোন শরীরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। অক্সিটোসিন মিশ্রিত দুধ খাওয়ার ফলে শরীরে ঢুকে হরমোনটি ভেঙে গেলেও ক্ষতিকর প্রভাব কিন্তু থেকে যায়। এর প্রভবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রজস্বলা নারীর ঋতুচক্র অনিয়মিত হয়, রজঃ নিবৃত্তি দ্রুত হয়। মেয়েদের স্তনগ্রন্থির অকাল'স্ফীতি ঘটতে পারে। মুখের লোম বেড়ে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতা ও বহুমূত্র রোগের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া পেটের অসুখ বাড়ে। প্রসঙ্গতঃ, ফোটানো হলেও দুধ এই হরমোনের প্রভাবমুক্ত হয় না। ভারতের প্রায় সমস্ত ডেয়ারিতেই এখন হরমোনের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, কম ফ্যাটযুক্ত বা ফ্যাটহীন দুধের চাহিদা আজকাল যথেষ্ট বেড়েছে। সম্প্রতি জাপান ও নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা পৃথক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, ফ্যাটহীন দুধে হৃদরোগের আশঙ্কা বেশি। তাঁরা দেখেছেন, দুধের ৮০ ভাগ প্রোটিন ক্যাপটিন জাতীয়। এই প্রোটিন চার রকমের। দুধে ফ্যাটের মাত্রা যত কমবে, প্রোটিনের সংযুক্তিতে তত তফাৎ আসবে। ফলে অন্যতম প্রোটিন 'বিটা ক্যাপটিন' ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। অথচ এই ক্যাপটিন হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়।

তবুও মনে রাখবেন মাতৃদুগ্ধই শিশুর সেরা খাদ্য। দুধ গুঁড়ো দুধ বা গরু-মোষের দুধের থেকে বেশি উপকারী। দাস্ত বমি ও ঠান্ডা লাগা জ্বরে শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশি। প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ শিশু এভাবে অকালে মারা যায়। তাই মায়েদের সচেতন হতে হবে। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, শিশু জন্মানোর পর চার মাস থেকে ছয় বছর অবধি মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে শিশুরা শরীরের চাহিদা মত সবরকমের পুষ্টির যোগান পায়। ফলে শিশুর হজম শক্তি বাড়ে, শরীরে প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। শ্বাস- শ্বাস ও ভাইরাসঘটিত রোগ থেকে অব্যাহতি পায়। এটি মা-শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। নিয়মিত স্তন্য দুগ্ধ পান করালে স্তন কিংবা ডিম্বাশয়ের কর্কট রোগের সম্ভাবনাও কম থাকে। গরুর দুধ বা গুঁড়ো দুধে কেসিন বেশি থাকায় অনেক শিশুর অ্যালার্জি হয়; পাতলা পায়খানা, সর্দিকাশি, বমি লেগেই থাকে। এইসব চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা ছাড়াও স্তনের দুধের পানের ব্যাপারে কিছু মানবিক দিকও আছে। যাঁরা পরিবার ছোট রাখতে চান স্তনের দুধ পান করালে তাঁরাও উপকৃত হতে পারবেন, ইউনিসেফের রিপোর্ট তাই বলছে। তবুও মাতৃ দুগ্ধে কীটনাশকের বা দূষণের আশঙ্কা যে থেকে যায়, তার জন্য তো মানুষই দায়ী। শুধুমাত্র কিছু মানুষের সচেতনতার অভাবেই গোটা মনুষ্যসমাজ আজ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই পরিবেশ দূষণের মূল কারণটা যখন মানুষ, দূষণমুক্ত করার দায়টাও মানুষের থাকা উচিত। তাই নয় কি?

— *তুষারকান্তি সলুই*, ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

✆ 25890019(R), 9433977495
Subrata Das
D.M. Club Member Agent, LICI (Kalyani Branch)
: Residence :
Purbasha, Gokulpur, P.O. Kantaganj- 741250

With Best Compliments from
ABHIJIT GHOSH
Kanchrapara

সূর্যগ্রহণ দেখুন, কুসংস্কারমুক্ত হোন

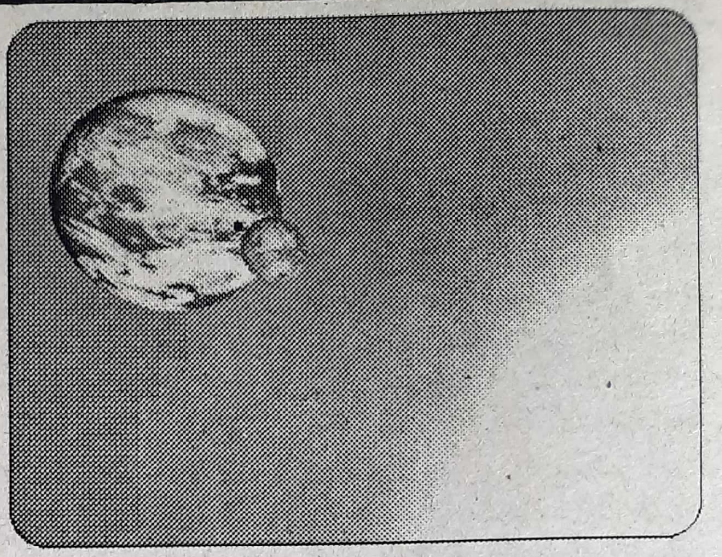

কাশ্যপ মুনির এক দানব সন্তান ছিল। তার নাম বিপ্রচিত্তি। বৈমাত্রেয় বোন সিংহিকা-কে বিয়ে করার পর বিপ্রচিত্তি-সিংহিকার চোদ্দোটি দানব সন্তান হয়। ওই চোদ্দ সন্তানের অন্যতম হল রাহু।

অমর হওয়ার লোভে দেবতা-দানবরা মিলে সমুদ্র মন্থন করে যখন অমৃতের কলসি তুলে আনল তখন কারা আগে খাবে তা নিয়ে বাধল ঝামেলা। তখন দেবতা বিষ্ণু সুন্দরী নারীর বেশে হাজির হয়ে কলসি থেকে অমৃত বণ্টন করতে চাইল। লাইন দিয়ে দেবতারা বসল একদিকে, দানবরা অন্যদিকে। বিষ্ণুর মনে ছিল অন্য ধান্ধা। সে দেবতাদের অমৃত দিয়ে দানবদের পায়েস দিতে চাইল। এদিকে রাহু দেবতার সাজে দেবতাদের লাইনে খেতে বসে গেল। বিষ্ণু রাহুর ছদ্মবেশ বুঝতে না পেরে তার পাতে অমৃত দিয়ে দিল। পাশে বসা চন্দ্র ও সূর্য, দুই দেবতা, রাহুকে চিনতে পেরে বিষ্ণুকে সে কথা বলে দিল। সাথে সাথে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে ঘ্যাঁচ করে রাহুর গলা দিল কেটে। রাহুর ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কী? ততক্ষণে রাহু অমৃত গিলে নিয়েছে। ফলে রাহু কাটা মাথা ও ধড় নিয়েই বেঁচে রইল। মাথার নাম থেকে গেল রাহু এবং ধড়ের নাম হল কেতু।

এদিকে চাঁদ ও সূর্য রাহুকে ধরিয়ে দিয়েছিল বলে রাহু তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইল। সুযোগ পেলেই রাহু গিলে নেয় চাঁদ ও সূর্যকে। রাহু যখন চাঁদকে গিলে নেয়, তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ। যখন সূর্যকে গিলে নেয়, তখন হয় সূর্যগ্রহণ। কিন্তু রাহুর গলা কাটা থাকায় চাঁদ বা সূর্যকে পাকস্থলিতে চালান করতে পারে না, কাটা গলা দিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ে।

এই হল বিষ্ণুপুরাণে গ্রহণের গপ্পো। শুনতে খুব ভালো লাগলেও এতো আসল গপ্পো নয়, গ্রহণের আসল গপ্পো অর্থাৎ প্রকৃত কারণ ক্লাস এইট পাশ যে কোনও ছাত্র-ছাত্রীই জানে। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে যখন চাঁদ চলে আসে তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেখানে মানুষ সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখতে পায় না। একেই বলে সূর্যগ্রহণ। আবার সূর্য ও চাঁদের মাঝে যখন পৃথিবী চলে আসে তখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে চাঁদের উপর। ফলে রাতের আকাশে চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ। এ নিয়ে বিস্তৃত সচিত্র আলোচনা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে। কিন্তু যা নেই তা হল এই গ্রহণকে কেন্দ্র করে মানুষের নানা কুসংস্কার।

জ্যোতিষীরা বলেন, যেহেতু রাহু ও কেতু হল দুটি অশুভ গ্রহ, তাই রাহুর গ্রাসে সূর্য এবং চাঁদ অশুচি হয়ে যায়। আর সেই সূর্য বা চাঁদকে রাহুর গিলে নেওয়ার সময় সেদিকে যে তাকাবে সে-ও অশুচি হয়ে যাবে। এমনকি গ্রহণরত সূর্য বা চাঁদের আলো গায়ে লাগলেও মানুষ হবে অশুচি। তাই গ্রহণের পর হিন্দু সমাজে স্নান করার রীতি আছে। আবার, গ্রহণের ছোঁয়ায় খাবার-দাবারও হয়ে যায় অশুচি। তাই, গ্রহণের সময় তো বটেই, গ্রহণের আগে রান্না করা খাবার খেতে নেই। ফেলে দিতে হয়। গ্রহণ শেষ হলে রান্না করে খাওয়া হল ধর্মীয় বিধান। প্রকৃতপক্ষে রাহু বা কেতু বলে কোনও গ্রহ বা মহাজাগতিক বস্তু অন্তত আমাদের চেনাজানা সৌরজগৎ বা সৌরজগতের বাইরে নেই। জ্যোতিষিরা রাহু ও কেতু বলে যে দুটো গ্রহের নাম বলেন তারা আসলে দুটো কল্পিত বিন্দু। অতীতে যখন ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা প্রচলিত ছিল তখন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যের পরিক্রমণ পথ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদের পরিক্রমণ পথের দুটি কল্পিত ছেদবিন্দু হল রাহু ও কেতু। সুতরাং এই কল্পিত বিন্দু রাহু কীভাবে যে সূর্য বা চাঁদকে গিলে খায় তার (অপ) ব্যাখ্যা জ্যোতিষীদের পক্ষেও বোধহয় আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু কথায় বলে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। কিছু অর্ধশিক্ষিত মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞানসচেতন বলে হাবে-ভাবে প্রকাশ করেন কিন্তু পেছনে কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানকে মদত দেন। এদের কাজ হল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে তথাকথিত বিজ্ঞানের মোড়কে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা। এঁরা ধর্মেও আছেন, জিরাফেও আছেন! মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে এঁরা করে-কম্মে খাচ্ছেন। এই সব স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা প্রচার করছেন, রাহু-কেতু বলে কিছু নেই। আসলে সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি আসে তা খাবার-দাবারকে বিষাক্ত করে দেয়। তাছাড়া, সূর্যগ্রহণের সময় যেহেতু সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না, তখন জীবাণুরা ভীষণই সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে খাবার-দাবার বিষিয়ে যায়। এইসব ব্যাখ্যা সহযোগে লেখা ৪/৫ টাকা দামের ২০/২৫ পৃষ্ঠার বইও বিক্রি হচ্ছে বাসে-ট্রেনে, স্টেশনে। আর এভাবেই কিছু মানুষ অপবিজ্ঞানের গোড়ায় ক্রমাগত সার-জল দিয়ে চলেছেন।

ব্যাপারখানা এমন, যেন সূর্যগ্রহণের সময়ই ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে। ঘটনা আদৌ তা নয়। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার। সাধারণ দৃশ্যমান আলোকরশ্মির (৪০০ থেকে ৮০০ ন্যানোমিটার) চেয়ে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এর শক্তি ও ভেদনক্ষমতা দৃশ্যমান আলোকরশ্মির চেয়ে বেশি। সৌর বিকিরণের প্রায় ৭ শতাংশ হল অতিবেগুনি রশ্মি। এই রশ্মি তিন প্রকার UV-A, UV-B এবং UV-C। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষতিকর UV-C-র প্রায় পুরোটাই ওজোন স্তরে শোষিত হয়। কিন্তু UV-B রশ্মির উপকারী ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। UV-B রশ্মির প্রভাবে ত্বকে ভিটামিন-D সংশ্লেষিত হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, UV-A এবং UV-B রশ্মির মানবত্বক ভেদ করার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তবে ত্বকে বেশি মাত্রায় পড়লে ত্বকের ক্যানসার হতে পারে। সুতরাং, সূর্যগ্রহণের সময় বাইরে থাকলে ওই অল্প সময়ে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কাজের প্রয়োজনে যদি দিনের বেলা বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারি আর তাতে যদি অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, তবে সূর্যগ্রহণের সময়ও ত্বকের কোনও ক্ষতি হবে না।

এরপর ৪ পাতায়

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু

1 পাতার পর

করে নক্ষত্রের নাম দেওয়া যায়, তবে চারহাজার কোটি নক্ষত্রের নাম দিতে লাগবে ১৭০০ বছর। নক্ষত্ররা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। এই দূরত্বের ধারণা কিলোমিটার হিসাবে দিতে অসুবিধা বলে আলোকবর্ষকে একক ধরা হয়। আলোর গতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। যে নক্ষত্র পৃথিবী থেকে ৮৩ লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। তার থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে লাগে আট বছরের মতন। আমরা বলব, এটি আট আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে।

এইবার আসি, নক্ষত্রের জন্মের আদিতে। মহাজাগতির গ্যাস ও ধূলিকণা অভিকর্ষের অন্তর্মুখী টানে ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে প্রোটোস্টার বা প্রাথমিক নক্ষত্রের সূচনা করে। ঘনীভবনের ফলস্বরূপ একই সঙ্গে চাপ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে এগুলো বাষ্পীয় অবস্থায় পৌঁছিয়ে মেন সিকোয়েন্স বা স্বাভাবিক নক্ষত্রের জন্ম দেয়। এইরকম একটি জ্যোতিষ্ক সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হচ্ছে ৬০০০০ সেলসিয়াস। আনুমানিক পাঁচ শত কোটি বছর আগে সূর্যের জন্ম ও আগামী পাঁচশত কোটি বছরের মধ্যে এর অবলুপ্তির সম্ভাবনা কম। সূর্য একটি মাঝারি মাপের নক্ষত্র ও সে এখন তার মধ্য বয়সে।

যে কোনও নক্ষত্রের সব সময়ে দুটি বিপরীতমুখী বল স্বতঃই কার্যকরী হচ্ছে। একটি হচ্ছে নক্ষত্রের কেন্দ্রমুখী অভিকর্ষের টান এবং অপরটি হল আভ্যন্তরীণ পারমানবিক বিক্রিয়ায় (নিউক্লিয়ার ফিউশান) যে শক্তি বিকিরণ হয়। তার বহির্মুখী চাপ। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী চাপ, নক্ষত্রের ভারসাম্য বজায় রেখে চলে।

সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড। যার ৬৫ শতাংশই হাইড্রোজেন। কী ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া সূর্যের মধ্যে ঘটে চলেছে? অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে উদ্ভূত হচ্ছে হিলিয়াম এবং সাথে সাথে উৎসারিত হচ্ছে সৌরশক্তি ও বিকিরণ।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় মন্ডলে যখন হিলিয়ামের পরিমাণ বাড়তে থাকে তখন কেন্দ্রের অন্তঃস্থলে শুরু হয় সংকোচন। আর, বাইরের গ্যাসীয় পরিমন্ডল অন্তর্মুখী অভিকর্ষের টান অতিক্রম করে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে চায়। নক্ষত্রের আয়তন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে, তার রঙ হয় রক্ত রাঙা। কিন্তু তাপমাত্রা কম হওয়ায় দেখায় অনুজ্জ্বল। নক্ষত্রের এই অবস্থার নাম Red Giant বা লাল দানব। এরপর অবিরত বিকিরণের ফলে, নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক জ্বালানির সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে আসে ও বহির্মুখী চাপও হ্রাস পায়। তখন কেন্দ্রাভিমুখী অভিকর্ষের টান হয় জোরদার। নক্ষত্রের আয়তন হ্রাস পেতে থাকে। ফলতঃ ঘনত্ব বাড়ে। ১৯৮৪-তে ভারতসন্তান ও মার্কিন নাগরিক সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর নক্ষত্রের বিবর্তনবাদের ওপর গবেষণা করে নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন। নক্ষত্র-সম্পর্কিত তাঁর প্রমাণিত গাণিতিক সূত্র হল 'চন্দ্রশেখর-সীমা'।

চন্দ্রশেখর সীমা অনুযায়ী যে সকল নক্ষত্রের ভর সৌরভরের ১.৪ গুণ অপেক্ষা কম, তাদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রায় পরমাণু ভেঙে গিয়ে মুক্ত ইলেকট্রনের ঘুর্ণায়মান গতিতে নতুন ইলেকট্রন গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের আয়তন কমতেই থাকে। যতক্ষণ না এই নতুন চাপ অন্তর্মুখী অভিকর্ষের সমান হচ্ছে। এই সমতা এলেই নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত কঠিন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রাকৃতি ঠান্ডা মৃত কঠিন অবস্থার নাম White dwarf বা শ্বেত বামন। অর্থাৎ আমাদের সূর্যের মৃত্যুও ঘটবে ঐ শ্বেত বামন অবস্থায় এসে।

আমাদের সূর্য দিনকে দিন উজ্জ্বলতর হচ্ছে। যতই সূর্য তার জ্বালানি শক্তি ক্ষয় করছে, তাপমাত্রা ততই বেড়ে চলেছে। হাইড্রোজেনের সাময়িক হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের ফলে অফুরন্ত শক্তি উৎসারণের সাথে সাথে চলছে অবিরাম বিকিরণ। যা ক্রমাগতই ঊর্ধ্বমুখী। সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণু, হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার প্রাক্কালে, আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ছাড়িয়ে যাবে একশত গুণ। হাইড্রোজেন হারাতে হারাতে, সূর্যের ব্যাস প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাবে, শেষ দিকে কমতে শুরু করবে। সৌরশক্তি হারিয়ে, পৃথিবীর প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে, তা কিন্তু সত্যি নয়। তার বহু আগেই সূর্যের তেজে ঝলসিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রাণোজ্জ্বল প্রাকৃতিক পরিবেশ। সূর্যের লাল দানব অবস্থাতেই সৌরতাপে আমাদের ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। তাতে হয়তো কঠিন শিলাচ্ছাদিত ভূত্বক গলবে না। কিন্তু সমুদ্রের জল ফুটতে শুরু করবে। বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হোক, সূর্যের শ্বেত বামন অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই যে পৃথিবীতে প্রাণের অঙ্কুর বিনষ্ট হবে না, এমন কল্পনা আপাততঃ অসম্ভবই মনে হয়।

যে সমস্ত গ্রহের সৌর দূরত্ব অনেক বেশি, সৌরতাপের মারাত্মক আতিশয্য সেখান থেকে অনুভূত নাও হতে পারে। হয়তো মানুষ ততদিনে কোনও সুদূর গ্রহান্তরে উপনিবেশ গড়ে নিতে পারবে, যেখানে অন্য কোনও নক্ষত্র প্রাণদায়ী আলোকশক্তি নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। চন্দ্রশেখর সীমার দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর সৌর ভর অপেক্ষা ১.৪ গুণ বেশি কিন্তু পাঁচগুণ অপেক্ষা কম, তাদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও প্রোটন পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায়, নিস্তড়িৎ নিউট্রনে পরিণত হবে। নিউট্রন গ্যাসের চাপ নগণ্য হওয়ায়, সেটি আর অন্তর্মুখী অভিকর্ষের টানের সংঘর্ষে আসবে না। বড় নক্ষত্রের শেষ জীবনে এই অবস্থার নাম নিউট্রন স্টার। আর, যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর, সৌরভরের পাঁচগুণকেও ছাড়িয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে ব্যাস দাঁড়িয়ে যেতে পারে মাত্র ১০ কিমি থেকে ১০০ কিমি এর মধ্যে। প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে ক্রমাগত সঙ্কোচন ও ঘনীভবনের ফলে নক্ষত্রের মধ্যে পদার্থের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। তার টান তখন এমনই দুর্নিবার, যে আলোক ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে পারবে না সেই সর্বগ্রাসী শক্তির টান কাটিয়ে। এই অদৃশ্য অবস্থার নাম হল কৃষ্ণ গহ্বর বা Black Hole। বিজ্ঞানীরা এমন কৃষ্ণ গহ্বরেরও সন্ধান পেয়েছেন, যেটি সূর্যের চেয়ে একশো কোটি গুণ ভারী।

আমাদের সূর্যের ব্যাস ১৩,৮০,০০০ কি.মি.। শ্বেত বামন অবস্থায় সূর্যের ব্যাস দাঁড়াবে ১৯,২০০ কি.মি. যা বৃস্পতি গ্রহের ব্যাসের এক দশমাংশ। মৃত সূর্যের গড়পড়তা ঘনত্ব হবে জলের ঘনত্বের তিন লক্ষ গুণ। কেন্দ্রের কাছে গড়পড়তা প্রতি ঘন সে.মি. ও ভর হবে তিন মেট্রিক টনের কাছাকাছি। — *অনিশা দত্ত*, ৯৮৩১৫৫১৮১৮

বিজ্ঞানের তাজা খবর

○ স্লীপিং-সিকনেস রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী অবদান। 'আফ্রিকার তারকা-বিজ্ঞানী' বলে অভিহিত উগান্ডার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ এনক মোটুভ-এর জন্য বৃটিশ রয়াল সোসাইটির ফাইজার পুরস্কার পেলেন। এই রোগে বছরে ৫০ হাজারের বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে। উক্ত আবিষ্কারের ফলে স্লীপিং-সিকনেস চিকিৎসায় বড় মাপের পরিবর্তন ঘটেছে। (বিবিসি, ৪-১১-০৮)

○ পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের হাতে সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে অনেক বেশি অণুজীব থাকে। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ৫১ জনের ১০২-টি হাত পরীক্ষা করে ৪৭০০ প্রজাতির অণুজীব পেয়েছেন। কারণ হিসেবে পুরুষদের হাতে অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য খবর, হাত ধোওয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করে জনচেতনা বাড়াতে এ বছর থেকে প্রত্যেক বছরের জন্য ১৪ অক্টোবরকে রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব হাত ধোওয়া দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। (বিবিসি, ৪-১১-০৮)।

○ পাটাগোনিয়ার বনে ডিজেল উৎপাদনকারী ছত্রাক আবিষ্কার। মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এই প্রথম জানা গেল *Gliocladium roseum* নামে একটি ছত্রাক সেলুলোজ ডাইজেস্ট করতে পারে। এর ফলে জৈব-ডিজেল তৈরির পদ্ধতি সহজতর ও দ্রুততর হবে। (গার্ডিয়ান, ৪-১১-০৮)।

○ ঢাক তৈরির এক কারিগর অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত পশুর চামড়া নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের অ্যানথ্রাক্স রোগ হবার ও রোগ হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা সমধিক। তাই বিশেষ সতর্কীকরণ দরকার। (ইন্ডপেন্ডেন্ট, ৩-১১-০৮)।

○ বিশ্বের বৃহত্তম শ্যাওলা (algae) দ্বারা তৈরি জৈব-জ্বালানী প্রকল্পের উদ্বোধন। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে পরিবেশে কার্বন নির্গমণ ৮০ শতাংশ কমানোর উদ্দেশ্যে বৃটেন ২৬ মিলিয়ন পাউন্ডের এই বিশাল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শ্যাওলা নিজেই যত্র তত্র জন্মায়, পরিস্কার করার দরকার নেই, খরচ ও নেই, প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি দ্রুত আহরণ করে, নিখরচায় জৈব-তেল এমনকি হাইড্রোজেন সরবরাহ করে। তাই একে শক্তির জগতের স্টেম-সেল বলা হচ্ছে। (গার্ডিয়ান, ৩১-১০-০৮)।

○ সোলার ফ্লাক্স (Solar Flux) ঃ পেট্রোলিয়ামের উপর নির্ভরতা এড়াতে সূর্যালোক থেকে নিরন্তর বিপুল পরিমাণে সস্তা, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কম দামের সোলার সেল তৈরি করছে সুইস সংস্থা ওয়েরলিকন (Oerlikon) । (সায়েন্টিফিক আমেরিকান ০৬-১২-২০০৮)।

○ মহাকাশে নতুন সৌরমন্ডল আবিষ্কার। পৃথিবী থেকে ১৩০ আলোকবর্ষ দূরে HR-8799 নামে পেগাসাস নক্ষত্রমন্ডলে অবস্থিত এই তারার চারদিকে ঘূর্ণ্যমান তিনটি উপগ্রহের চলমান ছবিও তুলেছেন কানাডার বিজ্ঞানীরা। (আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ১৮-১১-২০০৮)।

○ পরিবেশ দূষণের ফলে এশিয়ায় জনস্বাস্থ্য ও চাষ-আবাদে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে চীনে সূর্যালোকের ও ভারতে শস্যের ফলনে বিশেষ ঘাটতির কথা জানানো হয়েছে। (আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ১৮-১১-২০০৮)।

○ হৃদরোগ ও স্ট্রোকে মৃত্যুর সম্ভাবনা কমাতে কোলেস্টেরোলের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও এখন 'স্ট্যাটিন' খাবার পরামর্শ দিচ্ছে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন। (আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ১৮-১১-২০০৮)।

○ হার্টের অপারেশনে বয়স কোনো বাধা নয়। ৯০ বছর বয়সী রোগীরও হার্টের অপারেশন হয়েছে। (আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ১৮-১১-২০০৮)।

○ মোটা হবার বিপদ। বেশি ওজনের শিশুদের ধমনী পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে তা ৪৫ বছর বয়সীদের মত মোটা ও শক্ত যা তাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। (আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ১৮-১১-২০০৮)।

○ হাসির মত পছন্দসই গানও হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। (হার্ট-অর্গ, ১৮-১১-২০০৮)।

১৩। মেয়েদের জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিষেধক HPV-Vaccine ছেলেদের জন্যও উপকারী। (মেডিসিনেট, ১০-১১-২০০৮)

○ খাদ্য প্যাকেজিং-এর কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের রাসায়নিক বিস্ফেনল-এ (Bisphenol-A) প্রজনন ক্ষমতা কমাতে পারে। (মেডিসিনেট, ১০-১১-২০০৮)।

○ খরচের তুলনায় অ্যাঞ্জিও-প্লাস্টি সবসময় যথেষ্ট কার্যকর নয়। সুস্থজীবনযাত্রা ও ওষুধ কম খরচেই অনেক কাজ দেয়। (মেডিসিনেট, ১৩-১১-২০০৮)

○ নিয়মিত ব্যায়াম করেই বাতের ব্যাথাকে জয় করা সম্ভব। (মেডিসিনেট, ১৩-১১-২০০৮)

○ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়মিত নিলে থ্রম্বোসিসের আশঙ্কা কমে। (মেডিসিনেট, ১৩-১১-২০০৮)

○ খোদ আমেরিকাতেই বোতলের জল নিরাপদ পানীয় নয়। (মেডিসিনেট, ১৩-১১-২০০৮)

○ বিশ্বের প্রথম শ্বাসনালী প্রতিস্থাপন। (ল্যান্সেট, ১৯-১১-২০০৮)

○ টিস্যু-ইঞ্জিনিয়ারিং করা শিশুদের হার্ট-ভালভ, যা তার বয়সের সঙ্গে বাড়ে। (সায়েন্স ডেইলি, ২৩-০৮-২০০৮)

○ শৌচ ব্যবস্থা ও নিরাপদ পানীয় জল, দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রাথমিক প্রয়োজন। জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়। (সায়েন্স ডেইলি, ২০-১০-২০০৮)

○ উষ্ণায়নের ফলে ক্যাঙ্গারুরা বিপন্ন। (ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস জার্ণাল, ১৬-১০-২০০৮)

○ পৃথিবীর আবহাওয়ার দ্রুত বর্ধিত উষ্ণায়ণজনিত কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও হতে থাকবে এবং এর ফলে ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের শিকার হবে। (ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, সায়েন্স ডেইলি, ০৯-০১-২০০৯)।

○ হর্টিকালচারের মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক চাষীদেরআর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে বিগত ১৫ বছরে। কৃষি বিজ্ঞান ও উন্নয়নে চীনের এ এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

এরপর 6 পাতায়

বিজ্ঞানের তাজা খবর

5 পাতার পর

(স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ০৭-০১-২০০৯)

○ সমুদ্রের জলস্তর আগামী ১০০ বছরে ১ মিটার উচ্চতাবৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞদের অনুমানের চেয়ে এই বৃদ্ধির আশঙ্কা তিনগুণ বেশি। (কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়, বৃটেন ও ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের সংযুক্ত গবেষণার রিপোর্ট, ০৮-০১-২০০৯)

○ কোলেস্টেরোলের নিরাপদ স্বীকৃত মাত্রা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত। হৃদরোগে আক্রান্তদের প্রায় ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কোলেস্টেরোলের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৪১টি মার্কিন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ১,৩৬,৯০৫ জন রোগীর তথ্য থেকে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্তদের নিরাপদ LDL সীমা ১৫০ হলেও তাদের মধ্যে ৭২.১ শতাংশ জনের মাত্রা ১৩০-এর নীচে ছিল। প্রাক্তন রোগীদের অর্ধেকের ক্ষেত্রেই LDL কোলেস্টেরোলের মাত্রা ১০০-র (নিরাপদ সীমা হিসাবে গ্রাহ্য) নীচে এবং এদের ১৭.৬ শতাংশের LDL মাত্রা ছিল ৭০-এর চেয়েও কম। পক্ষান্তরে ভালো (HDL) কোলেস্টেরোলের মাত্রা ৫৪.৬ শতাংশের ক্ষেত্রে ছিল ৪০-এর নীচে (স্বীকৃত সীমা ৪৫-৮৫)। আমেরিকান হার্ট জার্ণাল, ১২-০১-২০০৯)।

○ পলিমার আবরণে ঢাকা ন্যানো-পার্টিকল, সুস্থ কোষকে এড়িয়ে অসুস্থ কোষে ওষুধ পৌছে দেবে। সব ওষুধেরই সুস্থ কোষের কম-বেশি ক্ষতি করার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা থাকে। ক্যান্সারের মত অনেক ক্ষেত্রে রোগের চেয়ে ওষুধকেই অনেক সময় বেশি ভীতিকর মনে হবার কারণ ঘটে। এই সমস্যা এড়াতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অসুস্থ কোষে ওষুধ পৌঁছে দেবার (Targeted Drug Delivery) প্রচেষ্টায় এই সাফল্য অর্জিত হলো। (পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১২-০১-২০০৯)।

○ মহাকাশ গবেষণাগার থেকে চক্ষুচিকিৎসায় আধুনিকতম যান্ত্রিক সহায়তা। একটি কমপ্যাক্ট ফাইবার-অপটিক প্রোব তৈরি হয়েছিল মহাকাশ গবেষণার কাজের জন্য। জানা গেছে সেটি সবচেয়ে প্রাথমিক অবস্থায় (চোখে ছানিপড়ার আগেই) স্বল্পব্যয়ে, সবচেয়ে সহজে ও নিরাপদে একটি বিশেষ প্রোটিনের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে ছানির সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে সক্ষম। এই পর্যায়ে জানা গেলে রোগী তার জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন (যথাঃ রোদ, ধূমপান ও কিছু ওষুধ পরিহার করে ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ) করে ছানিপড়ার সম্ভাবনা কমাতে পারে। এবং খেয়াল রাখবেন, পুরোনো ধারণা পাল্টেছে, ছানি সরু হয়ে গেলে লেন্স ধুসর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি তার যথাযথ অপারেশন করানো যায় ততই ভাল। (National Eye Institure/NIH/NASA, 12-01-2009)

— ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ৯৪৩৩২৪৪৯৪৫

শ্যাওলা বৈচিত্র্য

1 পাতার পর

শ্যাওলা সংগ্রহ করে জৈব সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। গোলাপ গাছের জন্য 'ল্যামিনারিয়া' ও 'ফুকাস' নামক শ্যাওলার যথেষ্ট কদর আছে। এরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ সহায়ক। শ্যাওলা পুড়িয়ে ছাইকে সার হিসাবে ব্যবহার করার রীতি বহু দেশে আছে। শ্যাওলার সঙ্গে সুপার ফসফেট ও অ্যামোনিয়া সালফেট মিশিয়ে খুব উঁচু মানের সার পাওয়া যায়।

পশু খাদ্য হিসাবেও শ্যাওলার ব্যবহার আছে। 'রেডিমেনিয়া' নামক এক শ্রেণির শ্যাওলা মেষ জাতীয় প্রাণীর প্রিয় খাদ্য। পোলট্রির মুরগীর জন্যও শ্যাওলা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আয়োডিন স্বল্পতার ক্ষেত্রে শ্যাওলা এক উৎকৃষ্ট আহার্য হিসাবে গণ্য হয়। নরওয়েতে ১৯১৭সালে প্রথম শ্যাওলাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রেও শ্যাওলার ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। গ্ল্যাণ্ডের অসুখে 'ডাইজেনিয়া সিমপ্লেকস' নামক একটি শ্যাওলা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পেটের অসুখে 'ফুকাস' ও 'ইউএরা' শ্যাওলা বিশেষ উপকারী। কিডনীর অসুখে 'অ্যাসিটেনিরিয়া মেজর' নামে একপ্রকার শ্যাওলা ব্যবহার হয়। নানারকম ঔষধ তৈরির কাজেও শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়, কারণ শ্যাওলা থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্যাওলার ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্রেও শ্যাওলার ব্যবহার রয়েছে। 'ল্যামিলারিন' ও 'ম্যানিটল' নামক যৌগ উৎপাদনে শ্যাওলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নানাধরনের ঔষধ, রেসিন, দেশলাই প্রভৃতি উৎপাদনের কাজে 'ম্যানিটল'- এর বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার, অ্যালাজিন প্রভৃতি উৎপাদনে শ্যাওলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'জেলিডিয়াম' নামক এক প্রকার শ্যাওলা থেকে 'আগর (agar) তৈয়ারি হয়। এটি একপ্রকার জেলজাতীয় কলয়েড পদার্থ। আইসক্রীম, জেলী, রুটি প্রভৃতি তৈরির কাজে এই আগরের ব্যাপক প্রয়োজন থাকে। একসময়ে জাপান ছিল আগর উৎপাদনে অগ্রণী। পরে অবশ্য, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও আগর উৎপাদনের ক্ষেত্রে সফল হয়। এছাড়াও, সাবান, জুতার পালিশ, প্রসাধন সামগ্রী, শ্যাম্পু ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্যাওলার ব্যবহার আছে।

শ্যাওলা থেকে খাদ্যও প্রস্তুত হয়। কথাটা আশ্চর্যের মনে হলেও, ঘটনাটি সত্যি। বহু প্রাচীন কালে চীনদেশে শ্যাওলা ছিল একরকম উপাদেয় খাদ্য। এই ঘটনা অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগেকার কথা। আমেরিকাতে পপ্‌কর্ণ এক অতি জনপ্রিয় মুখরোচক খাদ্য। আমাদের দেশেও এখন এটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এই পপ্‌কর্ণ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় 'রোডিমেনিয়া' নামক একপ্রকার শ্যাওলার। এইভাবে শ্যাওলার — বিশেষভাবে সামুদ্রিক শ্যাওলার নানারকম ব্যবহার আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হচ্ছে। সুতরাং শ্যাওলা যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ, সেই বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে হয়ত এই শ্যাওলাকে আরো ব্যাপকভাবে মানুষের প্রয়োজন লাগানো সম্ভব হবে, সেই আশা করাটা অসমীচীন নয়।

— ডঃ সমীর কুমার ঘোষ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, ৯৪৩৪১৫৭৭৫৩

গাইঘাটার ঝড়

সম্প্রতি ঘটে গেল 'আয়লা' ঝড়। আজকের আলোচনা ২৪/২৫ বছর আগেকার ঝড় নিয়ে। ১২-০৪-১৯৮৩ - র সন্ধ্যায় প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে উঃ ২৪ পরগণার গাইঘাটা অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় — ২৩ জনের মৃত্যু, আহতের সংখ্যা বহুগুণ। ঘর-বাড়ি-গাছপালা পাল্লা দিয়ে ভেঙেছে অথচ কলাসীমা বাজারের কাছে কালী মন্দিরে আঁচড় লাগেনি, যদিও আশেপাশে ঘটেছে প্রলয় কান্ড। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ঠাসা ধর্মীয় মেলা, ঠাকুরনগরের বারুণী মেলাতে ঝড়ের আঁচ লাগেনি। মেলার কাছ দিয়ে ঝড় চলে গেছে রেললাইনের দু'টি পোস্ট মুচড়ে দিয়ে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা শিহরিত; এ ঝড় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রোষের বহিঃপ্রকাশ। এমন ঝড় ভুক্তভোগীরা জন্মেও দেখেননি। এ ধরনের ঝড়ের প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত; খেয়ালী চালচলন। এর নাম টর্নেডো। কালবৈশাখীর উৎপত্তি যে মেঘে সেই 'কিউমুলোনিম্বাস' ধরনের মেঘ থেকেই টর্নেডোর উৎপত্তি। বজ্রগর্ভ ঝটিকা মেঘ মুষলধারে বৃষ্টি ঝরায়। সাথে শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত ঘটাতেও জুড়ি নেই। মাটি থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উপর থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ/চল্লিশ হাজার ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত এই মেঘে সবসময় ভীষণ আলোড়ন চলতে থাকে কয়েক লক্ষ টন জলীয় বাষ্প নিয়ে। এই মেঘ ইতস্তত ঘুরতে থাকে, পাক খেতে থাকে অনবরত। কখনো কখনো মেঘের নিচের অংশে আলোড়ন এত তীব্র হয়ে ওঠে যে পাকানো রিং বা স্প্রিং-এর মত আকৃতি নিয়ে তা ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশ' কিমি বেগে প্রবল পাক খেতে খেতে নেমে আসে মাটির দিকে। উপরের অংশ আটকে থাকে মেঘেরসাথে। টিউব বা ফানেলের মত কিংবা বলা ভাল হাতির শুঁড়ের মত তা দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে, কোন কোন সময় ১০০-১৫০ কিমি বেগে। শুঁড় কখনও মাটি ছুঁয়ে চলে, কখনও তা উঠে যায় উপরে। যেন পাগলা হাতি। শুঁড় বা টিউব মাটিতে যে অঞ্চল স্পর্শ করে চলে সেখানে দুর্গতির শেষ নেই। কালবৈশাখী, সাইক্লোন ইত্যাদি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ধ্বংস করে। সেই তুলনায় নগণ্য অঞ্চল জুড়ে ঘটা টর্নেডোর কাছে তারা যেন শিশু। দু'ফুট থেকে কয়েকশ' ফুট চওড়া হতে পারে এই শুঁড় বা টিউব। টিউবের মাঝের অংশ শান্ত থাকে। যত শক্তি তা থাকে ভীমবেগে পাক খাওয়া প্রান্তে বা পাঁচিলে। পাঁচিলের বাইরে কোনও ধ্বংসক্ষমতা থাকে না। পাঁচিলের আওতায় পড়ে গেলেই সর্বনাশ। প্রবল আকর্ষণে তুলে নেয় শুঁড়ে। প্রবল বেগে পাক খেতে খেতে ক্রমশ উপরে উঠে যায় শুঁড় বেয়ে; তারপর একসময় ছিটকে পড়ে। প্রকৃতি অনুসারে এই শুঁড়গুলোকে ফানেল, টিউব, টুইস্টার ইত্যাদি বলা হয়। অনেক সময় এক মেঘে একাধিক টিউব দেখা যায়। কোনটি মাটি ছুঁয়ে হেলে-দুলে চলছে। কোনটি বা ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে, কোনওটি বা মাটি থেকে হঠাৎ উঠছে, হঠাৎ নামছে আবার কোনওটি শুধুই শূন্যে দুলতে দুলতে চলছে। বড়ই খামখেয়ালি। এর শক্তিও বাড়ে কমে।

দু'টি বিজ্ঞান সংগঠনের প্রতিনিধি দলের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় এই টর্নেডো পাঁচ/ছয়শ' ফুট চওড়া অঞ্চল দিয়ে সামান্য আঁকাবাঁকা পথে বয়ে গেছে, কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে। মাঝে মাঝে কয়েক চিলতে জায়গায় ধ্বংলীলা ঘটেনি। কোনও ক্ষেত্রে গ্রামের একমাত্র দোতলা বাড়িটি শুধু ভেঙেছে। কুঁড়ে ঘরের টিনের চাল উড়ে গেলেও বাঁশের বাতা-র বেড়া অক্ষত আছে। সুপারি ও অন্য গাছের মুন্ডু উড়ে গেলেও কান্ড দাঁড়িয়ে আছে; কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে নিচু কলাগাছ ও ঝোপ। মোটা গাছ, এমনকি বাঁশঝাড়ও গুঁড়ি সমেত উপড়ে গেছে। মানুষ ও পশুকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে। একটি গরুর মাথা ছিঁড়ে উড়ে গেছে। নারকেল গাছে সবেগে বিঁধে গেছে ভাঙ্গা কুলোর চটা। মাছ সমেত পুকুরের জল উধাও হয়ে মাছবৃষ্টি ঘটেছে অন্যত্র। কোন কোন স্থানে ঝড়ের চলার পথে উঁচু গাছগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও খুব নিচু গাছ ও ঝোপ অবিকৃত ছিল। ভারতে প্রতি বছর গড়ে ২/৩ টি টর্নেডো ঘটলেও তা সাধারণত ফাঁকা পাথুরে প্রান্তরে ঘটার ফলে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় না। ১৯৭৭ সালে নদীয়া ও মেদিনীপুরের বহু মানুষ এই ঝড় প্রত্যক্ষ করেন। বিদেশেও টর্নেডো আকছার ঘটে। দু'একটি অদ্ভুত ঘটনা হল, দুধ দুইতে বসে গোয়ালিনী গরু উড়ে যেতে দেখেন। ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া দু'টি ঝড়ে উড়ে যায়, গাড়ি থাকে অক্ষত। এক ব্যক্তি হঠাৎ দেখেন মাথার কিছুটা দুরে একটি টিউব হঠাৎ নেমে এসে দুলছে। দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন তিনি। এই ঝড়কে নিয়েই হলিউডে একটি চমকপ্রদ চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। নিশ্চয়ই বোঝা গেল কলাসীমার কালী মন্দিরটি রক্ষা পাওয়ার কারণ কী। আরও কিছু তথ্য — মন্দিরের কাছেই ঝড়ের চলার পথে বাড়িগুলির টিনের ও টালির চাল উড়ে গেলেও কাঠামোর কোন ক্ষতি হয়নি। কাছেই দু'টি দরমার বেড়ার দোকানও ছিল অক্ষত। উঁচু ইলেকট্রিক পোস্ট দুমড়ে গেলেও পাশের নিচু কারখানা এবং বাথরুম অক্ষতই ছিল। এসব দেখে বোঝা যায়, টর্নেডোর মেঘ তার শুঁড় মুহূর্তের জন্য মাটি থেকে কিছুটা ওপরে তুলে নিয়ে গেছে, যেমন ঘটেছে অন্যান্য গ্রামে কিছু কিছু স্থানে, প্রকৃতির নিয়মে।

সন্ধ্যার আঁধারে মানুষ বিকট গর্জনের সাথে যে আগুনের গোলা দেখেছেন তা আসলে ঝড়ে পাক খাওয়া ধুলো ও অন্যান্য বস্তুর ঘর্ষণে উৎপন্ন প্রবল শব্দ এবং ঘর্ষণের কারণেই সৃষ্টি হওয়া অতি উচ্চবিভব-সম্পন্ন বিদ্যুতের (স্থির তড়িৎ) গোলক। লেখসূত্র — অলৌকিকতার নেপথ্যে - সম্পাদনা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, বনগাঁ শাখা)।

— তপন চন্দ
মাদারীহাট, জলপাইগুড়ি,
৯৭৩৩১৫৩৬৬১

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে কূটযুদ্ধ

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আজও পর্যন্ত মানুষ যে কাজ নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে তা হল প্রকৃতির রহস্যভেদ। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে বশে আনার এবং মানবজাতির স্বার্থে প্রকৃতিকে ব্যবহারের জন্য মানুষর লড়াই যেমন চলছে, তেমনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সম্পত্তিবান শাসকশ্রেণী, শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীকে অন্ধকারে রাখার প্রয়াসও চালিয়ে যাচ্ছে। শোষিত মানুষ যাতে এই ব্যবস্থায় তার দুর্দশাকে নিজের নিয়তি বলে মনে করে তার জন্য ধর্মীয় কু-সংস্কার এবং ভাববাদের প্রচার আর প্রসার শত শতগুণ বাড়িয়ে চলেছে। শাসকশ্রেণী তাদের পোষমানা বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত বিজ্ঞানীদের দিয়েই বলাচ্ছে যে মানুষের দ্বারা প্রকৃতির রহস্য পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়, ঈশ্বরের কাছে বিজ্ঞানের পরাজয় হবে এবং যে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দুনিয়া চলে, তারই ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের নিয়তি।

সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের উৎস সন্ধানে পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণায় বিজ্ঞানের কাছে ভাববাদের পরাজয় আশঙ্কা করে শাসকশ্রেণীর প্রচারমাধ্যম সুকৌশলে নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন নামজাদা বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে — সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আদি কণা এবং শক্তি থেকে ভরের উৎপত্তির যে খোঁজ চলছে তা নাকি ভগবানেরই রূপ এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই তার সৃষ্টি এবং ধর্মগ্রন্থে এর কথা নাকি আগেই বলা আছে। এই গবেষণায় নতুন কিছু আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে নাকি অসম্ভব।

২০-০৯-০৮ টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ডাঃ দীপক রাণাডে-র (নামজাদা নিউরোসার্জন) একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম— "সায়েন্টিফিক সার্চ ফর দ্য এলুসিভ পার্টিকেল"। এই রচনাতে রাণাডে লিখেছেন, "হিন্দুধর্ম ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করে যে, এই মহাবিশ্ব হল শিব এবং শক্তির সমন্বয়। শিব হল বস্তুগত পদার্থ এবং শক্তি হল, ধরাছোঁয়া যায় না বা বস্তু নয় এমন এনার্জি বা শক্তি, যা পদার্থের গুণগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। পদার্থ এবং শক্তি যেমন পরস্পরে পরিবর্তিত হয়, শিব এবং শক্তি-ও তেমনিই গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের আলাদা করা যায় না।

পদার্থকণা হল শিব এবং তার গতিপথ, এনার্জি, চার্জ ইত্যাদি হল শক্তি। হিগস্-বোসন কণাকে খোঁজা হল শক্তি-র মধ্যে শিব-কে খোঁজা। এই সন্ধান আসলে পদার্থের ভরের কারণকে খোঁজ করা — যা আসলে চূড়ান্ত সত্য বা ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপকে খোঁজা। সমগ্র গবেষণাটি হল গুণের পরিমানগত ভিত্তির সন্ধান-এর সাথে তুলনীয়। এটা যেন সেই কণাকে খুঁজে বেড়ানো যা সৌন্দর্যকে সুন্দর করে। যা মৌলিক (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা) তাকে কি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এমন কিছু পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব? ... বিজ্ঞান যতই আদি বাস্তবতার সন্ধানে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টাই নিক অবশেষে তা রহস্যময় থেকেই যাবে। ... হিগস্-বোসন কণার সন্ধান সবশেষে এক অবাস্তব তত্ত্বের বাস্তবতা না থাকার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে।"

দীপক রাণাডে বলতে চেয়েছেন, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় জগৎ সংসারের সৃষ্টি, তাই সৃষ্টির রহস্য সন্ধান বিজ্ঞানের কাছে অসাধ্য এবং অসম্ভব। যার খোঁজ বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নিরর্থক করতে যাচ্ছেন তা হাজার বছর আগে হিন্দু সভ্যতা ব্যাখ্যা করে গেছে — এতে নতুনত্ব কিছু নেই। জগৎ সংসার শিব এবং শক্তির দ্বারা গঠিত। অতীতের মত ছেঁদো কথা বলে মানুষকে যেহেতু সহজে ভুল বোঝানো যায় না, অন্ধকারে রাখা যায় না, সেকারণে শাসকশ্রেণী বর্তমানে বিজ্ঞানের মোড়কে অপবিজ্ঞান দিয়ে ধর্মান্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, বিজ্ঞানকে হেয় করতে চাইছে। গ্যালিলিও, ডারউইনদের বিজয়রথকে যেমন আটকে রাখা যায়নি; একদিন মাথা নত করে বিজ্ঞানের কাছে ধর্মকে পরাজয় মানতে হয়েছে। জগৎ সংসারের তথা সৃষ্টির রহস্য সন্ধানেও বিজ্ঞান একদিন সফল হবে। কোনো চালাকি বা মিথ্যা দিয়ে বিজ্ঞানের গতিপথ আটকে রাখা যাবে না। (লেখসূত্র ঃ 'আন্দোলনের সাথী', ২০-১০-০৮)

— তপন চন্দ,

গ্রাঃ ও পোঃ- মাদারীপুর, জলপাইগুড়ি ৯৭৩৩১৫৩৬৬১

সূর্যগ্রহণ দেখুন

3 পাতার পর

আমরা এমনিতেই ভোর ও সন্ধ্যাবেলায় সূর্য ছাড়া অন্য সময় আলোর তীব্রতার জন্য সূর্যের দিকে সরাসরি তাকাতে পারি না। সৌর বিকিরণের UV-B রশ্মি সরাসরি চোখে পড়লে কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, UV-A রশ্মি চোখের লেন্সের ক্ষতি করে। ফলে ছানি হতে পারে। তাই সূর্যগ্রহণের সময় যদি সোলার ফিল্টার দেওয়া চশমা বা X-ray প্লেটের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে তাকানো হয়, তবে কর্নিয়া বা লেন্স কোনোটারই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

এবার আসা যাক, খাবারে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে। সূর্যগ্রহণের সময় কয়েক মিনিটের জন্য আলো কমে গেলে যদি জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যায়, তবে তো সারা রাতে জীবাণুতে গিজগিজ করত গোটা পৃথিবী। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া উঠত শিকেয়। সুতরাং সহজ যুক্তি, রাতে বা মেঘলা দিনে যদি জীবাণুর সংখ্যা না বাড়ে তবে সূর্যগ্রহণের সময়ও জীবাণুর সংখ্যা বাড়তে পারে না। শুধু যুক্তিই নয়, হাতে-নাতে বহুবার পরীক্ষা করেও জীবাণু বৃদ্ধির অলীক তত্ত্ব প্রমাণিত হয়নি। বরং, চিকিৎসার জন্য ও গবেষণাগারে জল ও বাতাস জীবাণুমুক্ত করতে আজকাল UV-A ও UV-B রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে। সূর্যগ্রহণ হল এই সৌরজগতের অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু নয়ন মুগ্ধকর একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। সূর্যগ্রহণ নিয়মিত হয় না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ তো আবার এক-একবার পৃথিবীর এক-একটি অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র দেখাও যায় না। সাধারণ মানুষের জীবনে তাই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এক-দু'বারের বেশি আসে না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মতো অপরূপ দৃশ্য দেখার সুযোগ পেয়েও যদি কেউ কুসংস্কার আর অপবিজ্ঞানের ফাঁদে আটকে তা হারায় তবে তাকে হতভাগ্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। সূর্যগ্রহণ— তা পূর্ণগ্রাস বা খন্ডগ্রাস যাই-ই হোক, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবারই দেখা উচিত। এর মধ্যে দিয়ে মনের খোরাক যেমন মিটবে, তেমনই আমাদের করে তুলবে বিজ্ঞানমনস্ক, যা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজ একান্ত জরুরি।

— সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৯৪৩৪৫৭০১৩০

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯১২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী — সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in